ইউনিট ২
ধ্বনিতত্ত্ব : বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

পাঠ-২.১ : বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন।
- বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মৌলিক ও যৌগিক স্বরধ্বনি চিহ্নিত করতে পারবেন।

ধ্বনি :মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যা উচ্চারণ করে তা-ই ধ্বনি (Sound)। বাগযন্ত্রের সাহায্যে নানা রকমের ধ্বনি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এসব ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষার ধ্বনি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং তা অর্থপূর্ণ (meaningful)। বাগধ্বনি দু-প্রকার। যথা–

স্বরধ্বনি (vowel) ও

ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant)।

স্বরধ্বনি :যেসব বাগধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোথাও কোনো ধরনের বাধা পায় না সেগুলিই স্বরধ্বনি (Vowel)। যেমন–অ, আ, ই, ও, উ ইত্যাদি। কিছু স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নির্গত বাতাস কোনো রকম বাধা ছাড়াই একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের হয়। যেমন– অঁ, আঁ, উঁ, এঁ ইত্যাদি। এগুলিকে বলা হয় আনুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized Vowel)। স্বরধ্বনি সাধারণত ঘোষ (voiced) হয়। বাংলা ভাষায় সব স্বরধ্বনিই ঘোষ।

ব্যঞ্জনধ্বনি :যেসব বাগধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে কখনো সম্পূর্ণ কখনো আংশিক বাধা পেয়ে উচ্চারিত হয় তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন– ক্, খ্, র্, ল্, শ্, স্ ইত্যাদি। কিছু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, তারপর নাক দিয়ে বের হয়। যেমন–[ম্, ন্, ঙ্]।

বর্ণ : ধ্বনি লেখার জন্য যেসব প্রতীক বা সংকেত (symbol)ব্যবহার করা হয় সেগুলিই বর্ণ (Alphabet) ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন– ক, চ, ট, ত, প, ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয় (alphabets)।

***জ্ঞাতব্য* :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন– গ্+অ= গ, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি যুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে 'হস্' বা 'হল্' চিহ্ন (্) দিয়ে লিখতে হয়।

বাংলা বর্ণমালা : বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯)টি।

বর্ণের নাম	বর্ণ পরিচিতি	সংখ্যা
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	১১টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি
	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি
	ত থ দ ধ ন	৫টি
	প ফ ব ভ ম	৫টি
	য র ল	৩টি
	শ ষ স হ	৪টি
	ড় ঢ় য় ৎ	৪টি
	ং ঃ ঁ	৩টি
মোট বর্ণমালা		৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য :ঐ, ঔ–এ-দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন– অ + ই = ঐ, অ + উ= ঔ।
উপর্যুক্ত বর্ণসমূহকে মাত্রার উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- **মাত্রাহীন বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০ টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি এ, ঐ, ও, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)।
- **অর্ধমাত্রার বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)।
- **পূর্ণমাত্রার বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণ মাত্রার বর্ণ ৩২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।

মৌলিকতা অনুযায়ী, স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

মৌলিক স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক স্বর বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। যেমন– ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। বাংলা বর্ণমালায় 'অ্যা' ধ্বনিজ্ঞাপক কোনো বর্ণ নেই।

দ্বিস্বরধ্বনি :পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চরণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় যা দ্বিস্বর নামে পরিচিত। অর্থাৎ একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি–স্বর বলা হয়। দ্বিস্বরে দুটি স্বর থাকে একটি পূর্ণ, আর একটি অপূর্ণ। বাংলায় পরের স্বরটিই সাধারণত অর্ধ হয়। বাংলা ভাষায় ২৫টি যৌগিক স্বরধ্বনি রয়েছে। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে : ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ	দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ	দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ
আ+ই	আই	যাই, ভাই	ই+উ	ইউ	শিউলি	এ+আ	এয়া	কেয়া, দেয়া
আ+উ	আউ	লাউ	ই+এ	ইয়ে	বিয়ে	এ+ই	এই	সেই, নেই
আ+এ	আয়	যায়, খায়	ই+ও	ইও	নিও, দিও	এ+ও	এও	খেও
আ+ও	আও	যাও, খাও	উ+ই	উই	উই, শুই	ও+ও	ওও	শোও
ই+ই	ইই	দিই	উ+আ	উয়া	কুয়া			

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। এই রূপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত যে-কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত

হয়। **স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা 'কার'**। যেমন– 'আ'–এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। 'ম'-এর সঙ্গে 'আ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'া' যুক্ত হয়ে 'মা' হয়। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ–কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন–

আ–কার (া) ই–কার (ি) ঈ–কার (ী) উ–কার (ু) ঊ–কার (ূ)
ঋ–কার (ৃ) এ–কার (ে) ঐ–কার (ৈ) ও–কার (ো) ঔ–কার (ৌ)।

- বাংলা বর্ণমালায় 'অ'-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার নেই।

আকার (া) এবং ঈ-কার (ী) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ি), এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) এবং ঋ-কার (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিক যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মু, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন– ম্য, ম্র ইত্যাদি। **স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপকে যেমন 'কার' বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় 'ফলা'**। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নামানুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন– ম–এ–য ফলা = ম্য, ম–এ র–ফলা = ম্র, ম–এ ল–ফলা= ম্ল, ম–এ ব–ফলা = ম্ব। র–ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে 'ম্র'; আবার 'র' যদি ম–এর আগে উচ্চারিত হয়। যেমন– ম–এ রেফ 'র্ম' তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঞ্জনটির মাথায় রেফ (র্) দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন– হ-এ উ-কার =হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ–কার =শু, স-এ উ-কার = সু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঋ-কার=হৃ।

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণস্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছ বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় বর্গীয় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্নগুলোকেও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

বর্গ	বর্গীয় বর্ণ	বর্গের ভাষাবৈজ্ঞানিক নাম
ক	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য
চ	চ ছ জ ঝ ঞ	তালব্য
ট	ট ঠ ড ঢ ণ	মূর্ধন্য
ত	ত থ দ ধ ন	দন্ত্য
প	প ফ ব ভম	ওষ্ঠ্য

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে কী বলা হয়?

ক. স্বরবর্ণ খ. ব্যঞ্জনবর্ণ
গ. বর্ণমালা ঘ. মৌলিক স্বরধ্বনি

২. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ কয়টি?

ক. ৫০টি খ. ৩৯টি
গ. ১১টি ঘ. ২৪টি

৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ১১টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৩২টি

৪. বাংলা ভাষার মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?

ক. ২৪টি　　খ. ১১টি

গ. ৩২টি　　ঘ. ১০টি

৫. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

ক. কার　　খ. ফলা

গ. মৌলিক স্বর　　ঘ. দ্বিস্বর

৬. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

ক. কার　　খ. ফলা

গ. মৌলিক স্বর　　ঘ. বর্ণমালা

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ　২. ক　৩. খ　৪. ঘ　৫. ক　৬. খ　৭. গ　৮. গ

পাঠ-২.২ : ধ্বনির উচ্চারণবিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- স্বরধ্বনি উচ্চারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বরধ্বনির সঠিক উচ্চারণ করতে পারবেন।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

সাধারণত তিনটি মানদণ্ড দ্বারা স্বরধ্বনির উচ্চারণগত চরিত্র বিচার করা হয়, যথা–জিভের উচ্চতা (Tongue Height), জিভের অবস্থান (Tongue Position)এবং ঠোঁটের আকৃতি (Lip Attitude)। এছাড়া আরও কিছু মানদণ্ড আছে, বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণে এগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। যেমন– (ক) কোমল তালুর অবস্থা(State of Soft Palate): কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে মৌখিক (Oral)ও আনুনাসিক (Nasal)স্বর হিসেবে নির্দেশ করা হয়। (খ) স্বরের উচ্চারণকালের দৈর্ঘ্য (length) : সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে হ্রস্ব (Short)ও দীর্ঘ (Long)স্বর হিসেবে ভাগ করা হয়।

১. জিভের উচ্চতা : বিশেষ বিশেষ স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা নামে সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে উচ্চ (high), উচ্চ-মধ্য (high-mid), নিম্ন-মধ্য (low-mid) ও নিম্ন (low)স্বরধ্বনি হিসেবে নির্দেশ করা হয়।

- উচ্চ-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ সবচেয়ে উপরে ওঠে। যেমন– /ই, উ/।
- জিভ সবচেয়ে নিচে থাকা অবস্থায় উচ্চারিত হয় নিম্ন স্বরধ্বনি। যেমন– /আ/।
- উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে এবং উচ্চ-স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে থাকে। যেমন–/এ, ও/।
- নিম্ন–মধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনির চেয়ে নিচে ও নিম্ন স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে ওঠে। যেমন– /অ্যা, অ/।

উচ্চ	ই		উ
উচ্চ-মধ্য	এ		ও
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

২. জিভের অবস্থান : স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের যে অংশ সক্রিয় থাকে, সেই অংশের ভূমিকা অনুযায়ী স্বরধ্বনি বিচার করা হয়। সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলি সম্মুখ (front), মধ্য (center), ও পশ্চাৎ (back) স্বরধ্বনি হিসেবে গণ্য হয়।

- **সম্মুখ স্বরধ্বনি :** জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। যেমন– /ই, এ, অ্যা/।
- **মধ্য-স্বরধ্বনি :** জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে অর্থাৎ, সামনে কিংবা পেছনে না-সরে উচ্চারিত হয়। যেমন– /আ/
- **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি :** জিভ পিছিয়ে যায় এবং পেছনের অংশ সক্রিয় হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন–/অ, ও, উ/।

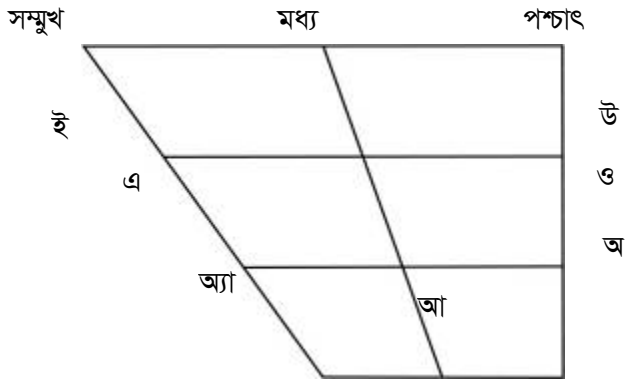

৩. ঠোঁটের গোলাকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি :স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট দুটি কখনও গোল কখনও ছড়ানো অবস্থায় থাকতে পারে। সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে গোলাকৃত (round)ও অগোলাকৃত (unround) স্বর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ক. গোলাকৃত স্বরধ্বনি : ঠোঁট গোল হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন– /অ, ও, উ/।
খ. অগোলাকৃত স্বরধ্বনি : ঠোঁট গোল না-হয়ে বিস্তৃত অবস্থায় থেকে উচ্চারণ করা হয়। যেমন– /ই, এ, অ্যা/।

৪. কোমল তালুর অবস্থান : কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে মৌখিক (Oral)ও আনুনাসিক (Nasal)এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল মুখ দিয়ে বের হয়। যেমন–/ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ/। অন্যদিকে আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস একইসঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়। ৭টি মৌলিক স্বরেরই সাতটি আনুনাসিক রূপ বা বৈচিত্র্য রয়েছে। /ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ/।

৫. স্বরের উচ্চারণকালের দৈর্ঘ্য : স্বরের উচ্চারণকাল অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে হ্রস্ব (Short)ও দীর্ঘ (Long)স্বর হিসেবে ভাগ করা হয়। বাংলা লিপিতে দুটি; [ঈ] এবং [ঊ] দীর্ঘ স্বর রয়েছে। দীর্ঘস্বর তখনই গণনা করা হয় যখন হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন–ইংরেজি βιτ [βιτ], βεατ [βι⎤τ]. কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় উচ্চারণ নেই। নদী শব্দের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে-উচ্চারণই করি না কেন তাতে অর্থের পার্থক্য ঘটে না। বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘস্বরের চিহ্ন আছে কিন্তু উচ্চারণ নেই।

৬. জ্ঞাতব্য
আ : বাংলায় আ–ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু–ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (Father) ও কাম (Calm)শব্দের আ (a)–এর মতো। যেমন– আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন– কাজ ও কাল শব্দের আ দীর্ঘ। এরূপ– যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।
ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই–ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ–ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ–দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন–বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।
উ ঊ : বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ–ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের বদ্ধাক্ষর বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষর উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন– চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ প্রভৃতি।
ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলেও ঋ–এর উচ্চারণ 'রি' অথবা 'রী'–এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র–ফলা + ই–কার এর মতো হয়। যেমন– ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)। বাংলায় ঋ–ধ্বনিটিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত আছে।
ঐ : ঐ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ই কিংবা ও+ই, ওই। অ এবং ই–এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ–ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন– ক্+অ+ই = কই, কৈ; ব্+ই+ধ = বৈধ ইত্যাদি। এরূপ– বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও–দীর্ঘ হয়। যেমন– গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণ হ্রস্ব হয়। যেমন– সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও–এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)–এর মতো।
এ : এ–ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম। সংবৃত ও বিবৃত। যেমন– মেঘ, সংবৃত, খেলা–(খ্যালা), বিবৃত।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন– ইংরেজি full–পূর্ণ এবং fool–বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে হ্রস্ব হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন– ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন, লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই–কার ও হ্রস্ব–উ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, ঈদুল ফিতর, ভূমি, লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ–কার এবং দীর্ঘ ঊ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটি মাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন– দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে কী বলে?
ক. মধ্যস্বরধ্বনি
খ. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি
গ. সম্মুখ স্বরধ্বনি
ঘ. গোলাকৃত স্বরধ্বনি

২. 'ঐ' স্বরধ্বনিটি–
ক. যৌগিক স্বরধ্বনি
খ. মৌলিক স্বরধ্বনি
গ. নিম্ন স্বরধ্বনি
ঘ. উচ্চ স্বরধ্বনি

৩. বাংলা লিপিতে কয়টি দীর্ঘস্বর আছে?
ক. ৫টি
খ. ৪টি
গ. ৩টি
ঘ. ২টি

৪. জিভের অবস্থা অনুযায়ী 'ও' কোন শ্রেণির স্বরধ্বনি?
ক. সম্মুখ
খ. মধ্য
গ. পশ্চাৎ
ঘ. কোনোটিই নয়।

৫. ঠোঁটের অবস্থা অনুযায়ী 'অ' কোন শ্রেণির স্বরধ্বনি?
ক. গোলাকৃত
খ. অগোলাকৃত
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. কোনোটিই নয়।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক

পাঠ-২.৩ : ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণরীতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- যুক্ত ব্যঞ্জন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উচ্চারণ স্থান ও রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনির বিভাজন করতে পারবেন।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যথা–ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান (place of Articulation) ও ধ্বনিগুলির উচ্চারণরীতি (Manner of Articulation)। যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা-ই উচ্চারণস্থান। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী দ্বি-ওষ্ঠ্য (Bilabial); দন্ত্য (Dental), দন্তমূলীয় (Alveolar), প্রতিবেষ্টিত (Retroflex), তালব্য-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar), তালব্য (Palatal), জিহ্বামূলীয় (Velaric), কণ্ঠনালীয় (Glottal) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. দ্বি-ওষ্ঠ্য : দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনগুলিই দ্বি-ওষ্ঠ্য। যেমন : /প/ পাপ, /ফ/ লাফ, /ব/ ডাব, /ম/ আম।

খ. দন্ত্য : জিভের সামানের অংশ উপরের পাটির কর্তন দাঁতকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। যেমন : /ত/ পাত, /থ/ পথ, /দ/ পদ।

গ. দন্তমূলীয় : জিভের সামনের অংশ ও উপরের পাটির দাঁতের মূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত ব্যঞ্জনগুলিই দন্তমূলীয়। যেমন– /স/ কাসতে, আসমান, /ন/ কান, /র/ ধার, /ল/ লাল

ঘ. প্রতিবেষ্টিত : জিভের সামনের অংশ সামনে বা পেছনে কুঞ্চিত হয়ে উৎপাদিত ব্যঞ্জন হলো প্রতিবেষ্টিত। যেমন–/ড়/ গাড়, /ঢ়/ আষাঢ় প্রভৃতি। হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষায় এ ধ্বনির অধিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঙ. তালব্য-দন্ত্যমূলীয় : জিভের সামনের অংশ উপরে গিয়ে শক্ত তালুকে স্পর্শ করে এ জাতীয় ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। যেমন : /ট/ পটপট, /ঠ/ ঠকঠক, /ড/ ডগডগ, /ঢ/ ঢকঢক।

চ. তালব্য : জিভের সামনের অংশ শক্ততালু স্পর্শ করে তালব্য ব্যঞ্জন উচ্চারণ করতে হয়। যেমন–/ছ/ ছলছল, /জ/ জগজ্জয়, /ঝ/ ঝকঝক।

ছ. জিহ্বামূলীয় : জিভের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। যেমন– /ক/ টিকটিক, /খ/ খনখন, /গ/ টগবগ, /ঘ/ ঘন-ঘন. /ঙ/ রঙচঙ (রংচং)।

জ. কণ্ঠনালীয় : কণ্ঠনালির মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এ ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। বাংলায় এ ধরনের ব্যঞ্জন একটি : /হ/ হনহন।

এছাড়াও ব্যঞ্জধ্বনির উচ্চারণ রুদ্ধ (Stops), মৌখিক (Oral), নাসিক্য (Nasal), ঘর্ষণজাত (Fricative), কম্পনজাত (Rolling/Trill), তাড়নজাত (Flap/Tap), পার্শ্বিক (Lateral), নৈকট্যমূলক (Approximant) প্রভৃতি রকমের হতে পারে।

ক. **রুদ্ধ :** বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে ও পরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত হয়। রুদ্ধ ব্যঞ্জনগুলিকে বায়ুপ্রবাহ কৌশল অনুযায়ী দু-শ্রেণিতে বদ্ধ করা হয়– মৌখিক (Oral) ও নাসিক্য (Nasal)।

১. মৌখিক : যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় এবং পরে কেবল মুখ দিয়ে বের হয় সেগুলিই মৌখিক রুদ্ধ ব্যঞ্জন। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এ শ্রেণির বাংলা রুদ্ধ ব্যঞ্জনগুলি হলো : দ্বি–ওষ্ঠ্য : /প্, ফ্, ব্, ভ,/, দন্ত্য : /ত্, থ্, দ্, ধ্/, জিহ্বামূলীয় : /ক্, খ্, গ্, ঘ্/।
২. নাসিক্য : বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, তারপর নাক ও মুখ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে এ জাতীয় ব্যঞ্জন তৈরি হয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জন হলো : দ্বি–ওষ্ঠ্য : /ম্/ : দন্তমূলীয় /ন্/ জিহ্বামূলীয় /ঙ্/।

খ. **ঘর্ষণজাত :** দুটি বাগযন্ত্র খুব কাছাকাছি আসে; কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত হয় না। ফলে বাতাস বাধা পায় ও সংকীর্ণ পথে বের হওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে বলে এগুলি ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলা হয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলা ঘর্ষণজাত ধ্বনি হচ্ছে : **দন্তমূলীয়** /স্/ : বস্ত্, কাস্তে, **তালব্য** : /শ/ দাশ, রাশ,হ্রাস, **কণ্ঠনালীয়** : /হ্/ হাট, হনহন।

গ. **তাড়নজাত :**জিভ উলটিয়ে এ ধ্বনি তৈরি হয়। উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উপরের শক্ত তালুতে একটিমাত্র টোকা দেয় বলে এগুলিকে টোকাজাত ধ্বনিও বলে। এ জাতীয় বাংলা **প্রতিবেষ্টিত** ব্যঞ্জন দুটি : /ড়্/ ধড়ফড়, বাড়, /ঢ়্/, গাঢ়, নিগূঢ়।

ঘ. **কম্পনজাত :**জিভ কম্পিত হয়ে বা দন্তমূল বারবার আঘাত করে উচ্চারিত হয় বলে এ-জাতীয় ব্যঞ্জনগুলিকে বলে কম্পনজাত। এ শ্রেণির বাংলা ব্যঞ্জন একটি : /র্/ যেমন– বার, ধার।

ঙ. **পার্শ্বিক :** বাতাস জিভের এক পাশ বা দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় বলে এসব ব্যঞ্জনকে বলে পার্শ্বিক। বাংলায় এ শ্রেণির ধ্বনি একটি : /ল্/ = তাল, শাল

চ. **নৈকট্যমূলক :**বাতাসের বাধার স্বাতন্ত্র্যের কারণে যেসব ধ্বনির উচ্চারণ স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির নিকটবর্তী সেগুলিই এ শ্রেণিতে পড়ে। বাংলা এ ধ্বনি আছে তিনটি : /ওয়া/ (অন্তস্থ-ব), হয় শব্দের [য়] (অন্তস্থ য়)।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি ছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বরতন্ত্রের অবস্থা (State of Soft Palate)অনুযায়ী বাগধ্বনিগুলির ঘোষ ও অঘোষ উচ্চারণ রয়েছে।

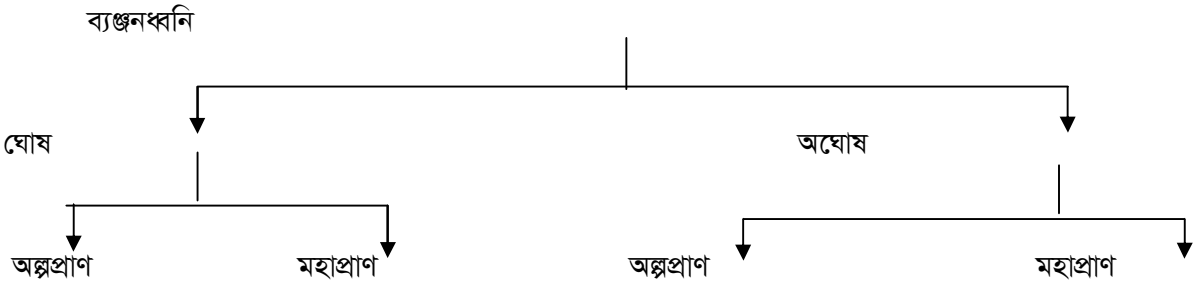

অঘোষ ধ্বনি : যেসব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না সেগুলিকে **অঘোষ ব্যঞ্জন**(Unvoiced)বলে। যেমন–ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ ।

ঘোষ ধ্বনি : যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় সেগুলিই **ঘোষ ধ্বনি**(Voiced)। যেমন–গ্ ঘ্ ঙ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ন্ ব্ ভ্ ম্ র্ ল্ ড়্ ঢ়্ হ্ ইত্যাদি।

এছাড়া মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের আধিক্য ও নিচের চোয়ালের মাংস পেশির চাপ অনুযায়ী ব্যঞ্জনগুলির মহাপ্রাণ (Aspirate) ও অল্পপ্রাণ(Unapirated)উচ্চারণ রয়েছে।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে মুখ দিয়ে কম বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে অল্প চাপ পড়ে তাকে **অল্পপ্রাণ ধ্বনি** বলা হয়। যেমন–/ক্ গ্ চ্ জ্/।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালে বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয় তাকে **মহাপ্রাণ ধ্বনি** বলা হয়। যেমন– /খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্/।

ধ্বনি উচ্চারণে দুটি বাক-প্রত্যঙ্গ জড়িত থাকে– সক্রিয় প্রত্যঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গ। সচল প্রত্যঙ্গটিই সক্রিয় প্রত্যঙ্গ (Active Articulator)। তুলনামূলকভাবে অনড় প্রত্যঙ্গটিই নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গ (Passive Articulator) হিসেবে পরিচিত। ধ্বনির নামকরণ সাধারণত নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গটির নামে হয়।

ধ্বনি	সক্রিয় উচ্চারক/প্রত্যঙ্গ	নিষ্ক্রিয় উচ্চারক/প্রত্যঙ্গ
দ্বি-ওষ্ঠ্য	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য	জিভের ডগা	উপরের দাঁত
দন্তমূলীয়	জিভের ডগা	দন্তমূল
প্রতিবেষ্টিত	কুঞ্চিত জিভের ডগা	দন্তমূলের পেছনের অংশ
তালব্য-দন্তমূলীয়	জিভের পাতা	দন্তমূলের পেছনের অংশ
তালব্য	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
জিহ্বামূলীয়	জিভের সামনের অংশ	কোমল তালু
কণ্ঠনালীয়	স্বররন্ধ্র	কণ্ঠনালি

বাক্–প্রত্যঙ্গ : ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলা হয় বাক্-প্রত্যঙ্গ। ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত বাক্-প্রত্যঙ্গগুলো হলো– ঠোঁট, দাঁতের পাটি, দন্তমূল, অগ্রদন্তমূল, শক্ত তালু, নরম তালু, আলজিভ, জিহবাগ্র, সম্মুখ জিহ্বা, পশ্চাৎ জিহ্বা, নাসা-গহ্বর, স্বরতন্ত্রী ও ফুসফুস।

নিচে উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণরীতি → / উচ্চারণ স্থান ↓		ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	মূর্ধন্য	তালব্য	জিহ্বামূলীয়	কণ্ঠনালীয়
স্পৃষ্ট	অঘোষ	প ফ	ত থ	ট ঠ	চ ছ	ক খ	
	ঘোষ	ব ভ	দ ধ	ড ঢ	জ ঝ	গ ঘ	
নাসিক্য		ম	ন			ঙ	
তাড়নজাত				(ড়)			
কম্পনজাত			র				
পার্শ্বিক		ল					
উষ্ম			(স)	(ষ)	শ		হ

জ্ঞাতব্য

১. ঙ ঞ ণ ন ম–এ পাঁচটি বর্ণ এবং ং ঃ ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে রেব হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি, আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় আনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

২. স্পর্শধ্বনি : যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পেয়ে যায় এবং বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয়, তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। ক থেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি।

৩. **উষ্মধ্বনি :** শ, ষ, স, হ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্মবর্ণ। শ ষ স–এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ।

৪. **পরাশ্রয়ী ধ্বনি :** ং, ঃ ঁ এ তিনটি স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র্য বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ। ং এর উচ্চারণ ঙ–এর উচ্চারণের মতো। যেমন– রং (রঙ), বাংলা (বাংলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং–এর বদলে ঙ এবং ঙ–এর বদলে ং–এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।খণ্ড–ত (ৎ)–কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র। ং ঃ ঁ –এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (Ligature)গঠিত হয়। সাধারণত এরূপ গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন– তক্তা (ত্ + অ + ক্ + ত্ + আ)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত– এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধরণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যথা–

ক. কার সহযোগে
খ. ফলা সহযোগে
গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে :স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ–কার (া)– মামা, বাবা, মা, পাখা, চাকা;
ই–কার (ি)– বিশ্ব, মিথ্যা, পানি, চিনি, গাড়ি;
ঈ–কার (ী)– শীতল, মন্ত্রী, নীতি, পত্নী, পরীক্ষা;
উ–কার (ু)–বুবু, খুকু, ফুফু;
ঊ–কার (ূ)– মূল্যবান, পূর্তি, অপূর্ব, পূজা, চূর্ণ;
ঋ–কার (ৃ)– নৃত্য, বৃথা, বৃষ্টি, গৃহ, কৃতী;
এ–কার (ে)– দেশ, শেষ, মেঘ, মেয়ে, ছেলে;
ঐ–কার (ৈ)– মৈত্রী, দৈত্য, সৈন্য, চৈত্র, বৈশাখ;
ও–কার (ো)– খোলা, দোলনা, বোকা, খোকা, ধোকা;
ঔ–কার (ৌ)–নৌকা, ভৌত, পৌষ, কৌতুক, যৌথ।

জ্ঞাতব্য : অ–এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

খ. ফলা সহযোগে : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারে পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন–

ণ/ন–ফলা (ণ/ন) প্রত্ন, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, চিহ্ন।
ব–ফলা (ব) – বিশ্ব, অশ্ব, নিঃস্ব, আশ্বাস, বিশ্বাস।
ম–ফলা (ম)– মৃন্ময়ী, পদ্মা, আত্ম, স্মৃতি, তন্ময়।
র–ফলা (্র)– গ্রহণ, ঘ্রাণ, স্রষ্টা, প্রণাম, প্রথম।
য–ফলা (্য)– ব্যঞ্জন, ইত্যাদি, লক্ষ্য, অ্যালবাম।
(র্ রেফ)–কর্ণ, ধর্ম, বর্ণ, বিতর্ক, অর্ক।
ল–ফলা (ল)– অক্লান্ত, অম্ল, উল্লাস, প্লাবন, পল্লব।

বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা– অ্যালবাম, অ্যালামনাই, অ্যালার্ম, অ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যাপোলো ইত্যাদি।

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন–সন্ধি, সন্ধ্যা, প্লাবন, মূর্খ, সন্ন্যান ইত্যাদি। নিচে কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন, তাদের গঠন ও উদাহরণ দেখানো হলো :

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ক্ক	ক্+ক = ক্ক	সক্কাল, ধাক্কা, পাক্কা, বৃক্ক, ছক্কা
ক্ব	ক্+ব = ক্ব	পক্ব, নিক্বণ
ক্ত	ক্+ত = ক্ত	শক্ত, ভক্ত, রক্ত, বিরক্ত, ডাক্তার
ক্স	ক্+স = ক্স	রিক্সা, বাক্স
ক্ষ	ক্+ষ = ক্ষ	সুরক্ষা, ভিক্ষা, শিক্ষা, কক্ষ, দক্ষ
ক্ষ্ম	হ্+ম = ক্ষ্ম	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম
জ্ঞ	জ্+ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, অজ্ঞান, সংজ্ঞা
ঞ্জ	ঞ্+জ = ঞ্জ	অঞ্জন, গঞ্জনা, গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ
ঞ্ছ	ঞ্+চ = ঞ্ছ	অঞ্চল, পঞ্চম, প্রপঞ্চ, সঞ্চয়, কঞ্চি
ষ্ণ	ষ্+ণ =ষ্ণ	উষ্ণ, কৃষ্ণ
ট্ট	ট্+ট = ট্ট	চট্টগ্রাম, হট্টগোল
ট্র	ট্ + র−ফলা (্র) = ট্র	রাষ্ট্র, উষ্ট্র,
ত্ত	ত্ + ত = ত্ত	উত্তাল, মত্ত, সত্তা, বিত্ত, বৃত্ত
ত্ন	ত্ + ন	যত্ন, রত্ন, প্রত্ন
ত্র	ত্ + র = ত্র	যাত্রী, পাত্র, ছাত্র, মিত্র, গোত্র
ক্র	ক্ + র = ক্র	ক্রম, ক্রয়, বিক্রয়, বক্র, ক্রিয়া
থ্থ	ত্ + থ = থ্থ	উত্থান, অশ্বত্থ
দ্ব	দ্ + ব ফলা = দ্ব	উদ্বেল, সদ্ব্যবহার
দ্ধ	দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ, উদ্ধার
গ্ধ	গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ, মুগ্ধ
ন্ধ	ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ, বন্ধ
ব্ধ	ব্ + ধ = বদ্ধ	উপলব্ধি, ক্ষুব্ধ
হ্ণ	হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ
হ্ন	হ্ + ন =হ্ন	চিহ্ন, আহ্নিক, মধ্যাহ্ন
হ্য	হ + য = হ্য	বাহ্যজ্ঞান, ঐতিহ্য
গ্ন	গ্ + ন = গ্ন	অগ্নি, মগ্ন
ণ্ড	ণ্ + ড = ণ্ড	কাণ্ড, কাণ্ডারী
ন্থ	ন্ + থ = ন্থ	পন্থা, মন্থর
স্থ	স্ + থ = স্থ	অস্থির, দুস্থ
স্ক	স্ + ক = স্ক	পুরস্কার, বয়স্ক
ষ্ক	ষ্ + ক = ষ্ক	শুষ্ক, নিষ্ক্রিয়
ণ্ণ	ণ্ + ণ = ণ্ণ	অক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ
ন্ন	ন্ + ন = ন্ন	অন্ন, ছন্ন
ম্ন	ম্ + ন = ম্ন	নিম্ন
ম্ম	ম্ + ম = ম্ম	সম্মতি, সম্মান
ন্ম	ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ, উন্মথিত
স্ট	স্ + ট = স্ট	মাস্টার, আগস্ট
ব্দ	ব্ + দ = ব্দ	জব্দ, শব্দ, অব্দ,
প্স	প্ + স = প্স	অভীপ্সা, লিপ্সা
দ্দ	দ্ + দ = দ্দ	উদ্দেশ্য, উদ্দীপক
ণ্ট	ণ্ + ট = ণ্ট	বণ্টন, ঘণ্টা
ল্ক	ল্ + ক = ল্ক	পাল্কি,মিল্কি, উল্কা
স্প	স্ + প = স্প	স্পন্দন, স্পষ্ট

স্ফ	স্ + ফ = স্ফ	স্ফটিক, প্রস্ফূটিত
ন্ত	ন্ + ত = ন্ত	অনন্ত, অন্তর
ন্দ	ন্ + দ = ন্দ	অভিনন্দন, আনন্দ
ন্ত্র	ন্ + ত্ + উ = ন্ত্র	কিন্ত্র, জন্ত্র, তন্ত্র
স্ত্র	স্ + ত্ + উ = স্ত্র	বস্ত্র, প্রস্তুত
ক্র	ত্ + র + উ = ত্র + উ = ক্র	শক্র, ক্রটি
ক্ষ্ম	ক্ + ষ্ + ম– ফলা = ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ন্ত্র্য	ন্ + ত্ + র– ফলা = ন্ত্র্য	স্বাতন্ত্র্য

ধ্বনিসংযুক্তি : উচ্চারণের সময়ে বিভিন্ন ধ্বনি একত্রে উচ্চারণ হয়, সেগুলিই ধ্বনিসংযুক্তি। এর অর্থ একটি ধ্বনির সঙ্গে আরেকটি ধ্বনিকে সংযুক্ত করা। এই ধ্বনিসংযুক্তি কখন ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে হয়, যেমন– উষ্ট্র (উ + ষ্ + ট + র্ + অ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী বলে?
ক. দ্বি-ওষ্ঠ্য খ. দন্তমূলীয়
গ. প্রতিবেষ্টিত ঘ. তালব্য

২. 'র' কোন জাতীয় ব্যঞ্জন?
ক. ঘর্ষণজাত খ. তাড়নজাত
গ. কম্পনজাত ঘ. পার্শ্বিক

৩. যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় তাকে কী বলে?
ক. অঘোষ ধ্বনি খ. ঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি

৪. 'ঞ্জ' এই যুক্ত ব্যঞ্জনের গঠন কী?
ক. জ্+ঞ খ. ঞ+চ
গ. ঞ+জ ঘ. ঞ+ণ

৫. উচ্চারণের সময় বিভিন্ন ধ্বনি একত্রে উচ্চারণ করা হলে তাকে কী বলে?
ক. ধ্বনিসংযুক্তি খ. ঘৃষ্ট
গ. নৈকট্যমূলক ঘ. মৌখিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :
১. ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য লিখুন।
২. মৌলিকতা অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন।
৩. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কী কী?
৪. দ্বি-স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৫. টীকা লিখুন– স্পর্শধ্বনি, উষ্মধ্বনি, যুক্তবর্ণ, নাসিক্য ধ্বনি, তাড়নজাত, পার্শ্বিক।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক

পাঠ-২.৪ : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ণ-ত্ব বিধান কী সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ণ-ত্ব–বিধানের নিয়ম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

ণ-ত্ব বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে 'ন' (দন্ত্য-ন) স্থানে 'ণ' (মূর্ধন্য-ণ) ব্যবহৃত হয় তাকে ণ-ত্ববিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান। যেমন– ঋণ, কারণ, মরণ, ভীষণ, ভাষণ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন –এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়।

ণ-ত্ব–বিধানের নিয়ম

১. ঋ, র, ষ– এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– ঋণ, ঘৃণা, অরণ্য, বর্ণ, চূর্ণ, পাষাণ, কৃষাণ ইত্যাদি।

২. ট–বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে সংযুক্ত আকারে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন–কণ্টক, ঘণ্টা, অকুণ্ঠ, কাণ্ড, খণ্ড ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ–এর পরে স্বরধ্বনি, য় ব হ ং এবং ক–বর্গীয় ও প–বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– কৃপণ (ঋ–কারের পরে প্, তারপরে ণ), হরিণ (র–এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্পণ (র্ + প্ + অ + ণ্), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + ন্)। এরূপ –তর্পণ, বর্ষণ, সমর্পণ, রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৪. পরি, প্র, নির–এ তিনটি উপসর্গের পর ণ-ত্ব বিধি অনুসারে ন–ধ্বনি লিখতে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন–পরিণত, পরিবহণ, প্রমাণ, প্রবণ, পরিণয়, প্রণত।
ব্যতিক্রম : পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, পরিবহন বানানও শুদ্ধ।

৫. উত্তর, পর, পার, রবীন্দ্র, চন্দ্র, নার শব্দের পরে 'অয়ন'/'আয়ন' প্রত্যয় হলে দন্ত্য ন পাল্টে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন– উত্তর + অয়ন = উত্তরায়ণ, পর + অয়ন = পরায়ণ, রবীন্দ্র + অয়ন = রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্র + অয়ন = চন্দ্রায়ণ, নর + অয়ন = নারায়ণ ইত্যাদি।

৬. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

ক. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে 'ন' হয়। যেমন–ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।

খ. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন– অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

গ. বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না।

ষ–ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ–এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'–এর ব্যবহার হয় তাকে ষ-ত্ব–বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ষ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান। যেমন– কৃষক, বিষ, বর্ষণ আষাঢ়, আভাষ ইত্যাদি।

ষ–ত্ব বিধানের নিয়ম

১. ঋ বা ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন– কৃষক, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষ্ণ, দৃষ্টি ইত্যাদি (ব্যতিক্রম : কৃশ্ ধাতু জাত কৃশ, কৃশতা, কৃশকায়)।

২. তৎসম শব্দে 'র'-এর পর 'ষ' হয়। যেমন– বর্ষণ, ঘর্ষণ, বর্ষা ইত্যাদি।

৩. রেফ-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন– আকর্ষণ, বর্ষ, মুমূর্ষু, বার্ষিক, সপ্তর্ষি।

৪. র–ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা– পরিষ্কার। অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা– পুরস্কার।

৫. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন– ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), চিকীর্ষা, চক্ষুষ্মান, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

৬. ই–কারান্ত এবং উ–কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন– প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অসুষঙ্গ, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।

৭. ট–বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়, যথা– অনিষ্ট, চেষ্টা, নষ্ট, বৈশিষ্ট্য, অনুষ্ঠান, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

৮. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন–

ভাষা ঊষা ষট্ আষাঢ় ভাষণ কষিত পাষাণ ইষু পাষণ্ড
কোষ কাষায় কাষ্ঠ কষ্ট আভাষ বাষ্প মানুষ অষ্ট
পৌষ পুষ্প কলুষ ঔষধ ভাষ্য ষড়যন্ত্র ভূষণ দ্বেষ ঋড়ঋতু
ষ-ত্ব–বিধির করে না দাস্য।

ষ–ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন– পোস্ট, মাস্টার, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন– ভূমিসাৎ, ধুলিসাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. 'ণ'-ত্ব বিধান' এর অর্থ কী?

ক. ন ব্যবহারের নিয়ম খ. ণ ব্যবহারের নিয়ম
গ. সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম ঘ. ণ-এর অপব্যবহার

২. **ণ-ত্ব বিধান কোন শব্দের জন্য প্রযোজ্য?**
ক. বাংলা শব্দ খ. বিদেশি শব্দ
গ. সংস্কৃত শব্দ ঘ. আরবি শব্দ

৩. **ণ-ত্ব বিধান মতে ঋ, র, ষ এর পরে যুক্ত হয়–**
ক. ন খ. ণ
গ. ন অথবা ণ ঘ. কোনো নিয়ম নেই

৪. **কোন বর্গের আগে কখনও ণ হয় না?**
ক. ট বর্গ খ. প বর্গ
গ. ব বর্গ ঘ. ত বর্গ

৫. **ষ-ত্ব বিধান দ্বারা জানা যায়**
ক. দেশি শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার খ. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
গ. মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার ঘ. সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার

৬. **ঋ ও র এর পর বসে**
ক. তালব্য-শ খ. দন্ত্য-স
গ. মূর্ধন্য-ষ ঘ. যে-কোনো স-ধ্বনি

৭. **"ষ-ত্ব বিধান" এর অর্থ কী?**
ক. মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়ম খ. বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম
গ. অধিকার সম্পর্কিত ঘ. মূর্ধন্য ষ-এর অনিয়ম

৮. **ট ও ঠ এর সঙ্গে সংযুক্ত আকারে বসে–**
ক. তালব্য-শ খ. দন্ত্য-স
গ. মূর্ধন্য-ষ ঘ. যে কোনো একটি স-ধ্বনি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম লিখুন।
২. ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ষ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম লিখুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. ক ৮. গ

পাঠ-২.৫ : ধ্বনির পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ধ্বনি পরিবর্তন কী তা বলতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ধ্বনি পরিবর্তন

উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ধ্বনিপরিবর্তন।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনিপরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো–

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগাম। যেমন– স্কুল >ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ, আস্তাবল, আস্পর্ধা ইত্যাদি।

২. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্য স্বরাগম (Anaptyxis) :উচ্চারণের সুবিধার জন্য সময় সময় যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই ধারাকে বিপ্রকর্ষ বলে। অর্থাৎ ছন্দ ও সুরের প্রয়োজনে কিংবা চলিত ভাষায় সহজ করে উচ্চারণের প্রবণতাবশত সংযুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মাঝে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন–

- **ই– স্বরের আগম :** প্রীতি >পিরীতি, ক্লিপ >কিলিপ, বর্ষণ > বরিষণ, ত্রিশ > তিরিশ, প্রীতি > পিরীতি, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
- **এ– ধ্বনির আগম :** ধ্যান >ধেয়ান, ব্যাকুল > বেয়াকুল, প্রায় > পেরায়, ঘ্রাণ > ঘেরান, স্রেফ >সেরেফ, গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক ইত্যাদি।
- **অ– স্বরধ্বনির আগম :** ভক্তি >ভকতি, ধর্ম > ধরম, শক্তি > শকতি, লগ্ন >লগন, রত্ন >রতন, হর্ষ >হরষ, দর্শন >দরশন ইত্যাদি।
- **উ– ধ্বনির আগম :** ভ্রু> ভুরু, শুক্রবার >শুক্কুরবার, দুর্জন >দুরুজন, মুক্তা >মুকুতা, তুর্ক >তুরুক ইত্যাদি।
- **ও– ধ্বনির আগম :** কুর্ক > কোরোক, শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) **:**কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন– দিশ্>দিশা, পোখত্> পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য >সত্যি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই–কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই–কার বা উ–কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন– বাক্য >বাইক্য, সত্য >সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, আজি > আইজ, সাধু >সাউধ, রাখিয়া > রাইখা ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন– ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসঙ্গতি (Vowel Hermony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে শব্দের মধ্যে অপর স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে প্রভাবকারী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি

রক্ষা করলে, এই রীতিকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি। যেমন– ইচ্ছা > ইচ্ছে, দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মূলা > মূলো ইত্যাদি। প্রধানত চারটি পদ্ধতিতে স্বরসঙ্গতি হয়ে থাকে। যথা–

- **প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive) :** পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– শিকা > শিকে, তুলা > তুলো, মিথ্যা >মিথ্যে, জুতা > জুতো, পুত্র >পুত্তুর, বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি ইত্যাদি।
- **পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive) :** পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত সরসঙ্গতি হয়। যেমন– আখো > আখুয়া >এখো, দেশি > দিশি, শুনা > শুনো, লিখা > লেখা, দেশি > দিশি, খেলা > খ্যালা ইত্যাদি।
- **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual) :** আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– ভিখারি >ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি, বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি।
- **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal) :** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বর তথা আদ্যস্বর ও অন্তস্বর পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– পোষ্য > পুষ্যি, মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো ইত্যাদি।
  চলতি বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি : মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে, গিলা > গেলা ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ–কার হলে পরবর্তী স্বর আ– কার হয় না, ও –কার হয়। যেমন– মাড়া > মুড়ো, চুলা >চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে –উড়ানি >উড়নি, এখনি >এখুনি হয়।

৭. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ। যেমন– আটমেসে >আটাসে, বসতি > বস্‌তি, কুটুম্ব > কুটুম, জানালা >জান্‌লা ইত্যাদি।

- **আদিস্বর লোপ (Aphesis) :** ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমের স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন– অলাবু >লাবু >লাউ, উদ্ধার >উধার > ধারইত্যাদি।
- **মধ্যস্বর লোপ (Syncope) :** সুবর্ণ >স্বর্ণ, আগুরু> অগ্রু ইত্যাদি।
- **অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) :** ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে বাদ গেলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন– আশা >আশ, আজি > আজ, চারি >চার, সন্ধা >সঞ্ঝা >সাঁঝ, লজ্জা >লাজ, চাকা >চাক ইত্যাদি।

৮. ধ্বনি বিপর্যয় :শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis) বলে। যেমন– বাক্‌স >বাস্‌ক, রিকসা >রিসকা, অনুরূপ পিশাচ >পিচাশ, লাফ >ফাল, মুকুট >মুটুক ইত্যাদি।

৯. সমীভবন (Assimilation) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে, তাকে বলা হয় সমীভবন। যেমন– জন্ম >জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি। সমীভবন তিন রীতিতে হয়, যথা–

- **প্রগত সমীভবন (Progressive) :** পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন– পক্ব > পক্ক, চন্দন > চন্নন, গলদা > গল্লা, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন >লগ্‌গ, চক্র> চক্কর, রাজ্য > রাজ্জ, স্বর্ণ >সন্ন ইত্যাদি।
- **পরাগত সমীভবন (Regressive) :** পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন– কাঁদনা > কান্না, কর্ম >কম্ম, কর্তা > কত্তা, ধর্ম > ধম্ম, করতাল > কত্তাল, পাঁচসের > পাঁশ্‌সের, ডাকঘর > ডাগ্‌ঘর, তৎ + জন্য >তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ >উন্মুখ ইত্যাদি।
- **অন্যোন্য সমীভবন (Mutual) :** যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন, যেমন– বৎসর > বচ্ছর, মহোৎসব >মোচ্ছব, চিকিৎসা > চিকিচ্ছা, বিশ্রি >বিচ্ছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত। সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা ইত্যাদি।

১০. বিষমীভবন (Dissimilation) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন– তরবার > তরোয়াল, লাঙ্গল >নাঙ্গল, শরীর > শরীল, লালা > নাল ইত্যাদি।

১১. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা (Long Consonant) : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা। যেমন– সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা, মুলুক > মুল্লুক, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, কিছু > কিচ্ছু ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। অর্থাৎ পদের অন্তর্গত কোনো বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন– শাক > শাগ, ধোবা > ধোপা, কবাট > কপাট, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন– বড়দাদা >বড়দা, বউদিদি >বউদি ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, ফাল্গুন > ফাগুন ইত্যাদি।

১৫. অভিশ্রুতি (Umlaut) : অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন– করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ–রাখিয়া > রাইখা, করিয়া >কইরা, শুনিয়া >শুইনা > শুনে, বলিয়া > বইলা > বলে, হাটুয়া >হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছুয়া >মেছো ইত্যাদি।

১৬. র–কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র–কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন– তর্ক >তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম ইত্যাদি।

১৭. হ–কার লোপ : আধুনিক চলতি বাংলায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ–কার লোপ হয়। যেমন– পুরোহিত >পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু >সাহু >সাউ, আরবি আল্লাহ্>বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ্>বাংলা শা ইত্যাদি।

১৮. য়–শ্রুতি ও ব–শ্রুতি (Euphonic glides = Yglide ওW-glide) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি–স্বর (যৌগিক স্বর) হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' [y] বা অন্তঃস্থ 'ব' [w]উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়–শ্রুতি ও ব– শ্রুতি। যেমন– মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার, যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া, ভাই + এ = ভাই (য়) এ = ভায়ে, খা + আ >খাওয়া, ধো + আ = ধোওয়া ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরভক্তি　　খ. অপিনিহিতি
গ. অসমীকরণ　　ঘ. আদি স্বরাগাম

২. একটি স্বরের প্রভাবে শব্দের অন্য শব্দের পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরসঙ্গতি　　খ. স্বরলোপ
গ. অভিশ্রুতি　　ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতি

৩. সুবর্ণ>স্বর্ণ কিসের উদাহরণ?

ক. আদিস্বর লোপ　　খ. মধ্যস্বর লোপ
গ. অন্ত্যস্বর লোপ　　ঘ. কোনটিই নয়।

৪. সত্য>সইত্য কিসের উদাহরণ?

ক. অপিনিহিতি　　খ. অসমীকরণ
গ. স্বরসঙ্গতি　　ঘ. সমীভবন

৫. স্টেশন>ইস্টিশন কিসের উদাহরণ?

ক. স্বরভক্তি　　খ. অন্তস্বরাগম
গ. আদিস্বরাগম　　ঘ. অপিনিহিতি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধ্বনি পরিবর্তন কী? ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ　২. খ　৩. ক　৪. ক　৫. গ

পাঠ-২.৬ : সন্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সন্ধি কী তা বলতে পারবেন।
- সন্ধির উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- সন্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সন্ধির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধির বিচ্ছেদ করতে পারবেন।

সন্ধি শব্দের অর্থ 'মিলন'। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তকেই বলা হয় **সন্ধি**। যেমন– আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) হএেছ। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত্ + ম = ন্ম হয়েছে। এরূপ রবীন্দ্র, চিন্ময়, উদ্ধত ইত্যাদি।

সন্ধির উদ্দেশ্য

সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাভাবিক **উচ্চারণে সহজপ্রবণতা** ও **ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন**। যেমন– 'রত্ন' ও 'আকর' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'রত্নাকর' তার চেয়ে কম আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ পিতৃ আলয় বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'পিত্রালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত ও শ্রুতিমধুর। তাহলে দেখা যাচ্ছে সন্ধির প্রধান সুবিধা উচ্চারণের। তবে যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সেক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু + আদা + আলু = কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা =কচ্চাল্বাদা হয় না।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

ভাষা বলতে ও লিখতে গেলে সন্ধির নিয়মগুলো জানা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে আমার বিভিন্ন ভাবে সন্ধির ব্যবহার করে থাকি। কাজেই সন্ধির প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ–

১. নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
২. ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. শব্দের আকার ছোট করতেও সন্ধির প্রয়োজন পড়ে।
৪. সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতিমধুর হয়।
৫. উচ্চারণ সহজ করার জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

সর্বোপরি ভাষার উচ্চারণের সৌকর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি; ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সন্ধির প্রকারভেদ

বাংলা সন্ধি দুই প্রকার; যথা– স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি। এছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত সন্ধিতে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি এবং বিসর্গ সন্ধি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

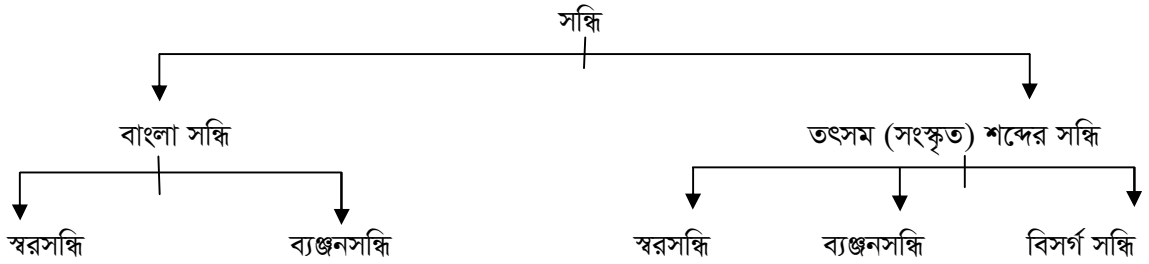

বাংলা শব্দের সন্ধি : বাংলা শব্দের সন্ধি স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি এই দুই ভাগে বিভক্ত।

১. স্বরসন্ধি :স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। অর্থাৎ স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্তরের একটির লোপ পায়। যেমন–

ক. ই+ এ = ই (এ লোপ)। যেমন– নদী + এর = নদীর, আশি + এর = আশির, কুড়ি + এক =কুড়িক। এরূপ ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।

খ. অ + এ = এ (অ লোপ)। যেমন– শত + এক = শতেক, এরূপ–কতেক।

গ. আ + আ + আ (একটি আ লোপ)। যেমন– শাঁখা + আরি = শাঁখারি, এরূপ রূপা + আলি = রূপালি।

ঘ. আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন– মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ–নিন্দুক, হিংসুক।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন– যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই। এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে। এরূপ, ছেলে + আমি = ছেলেমি (আ– লোপ), মেয়ে + আলি = মেয়েলি (আ–লোপা), গুটি + এক = গুটিক (এ–লোপ) ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)–এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি ঘোষ মিলে দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন– ছোট + দা = ছোটদা।

২. হলন্ত র্ (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন– চার + টি = চাট্টি, ধর্ + না + ধন্না, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই, আর্ + না = আন্না, ইত্যাদি।

৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত–বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ তবর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন– হাত + ছানি = হাচ্ছানি, বদ্ + জাত = বজ্জাত, নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ)।

৪. 'প'-এর পরে 'চ' এবং 'স'-এর পরে 'ত' এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন– সাত + শ = সাশ্‌শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্‌শিকা, পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ ইত্যাদি।

৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয়। যেমন– চুন + আরি = চুনারি, বোন + আই = বোনাই, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক ইত্যাদি।

৬. স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনসন্ধি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন– নাতি + বৌ = নাতবৌ, কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড় ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি :বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দে সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ নর + অধম = নরাধম। **এরূপ**–হিতাহিত, হিমাচল, হস্তান্তর, প্রণাধিক ইত্যাদি।
অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। **এরূপ**–সিংহাসন, দেবালয়, রত্নাকর ইত্যাদি।
আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথার্থ। **এরূপ**–মহার্ঘ, আশাতীত, কথামৃত ইত্যাদি।
আ + আ = আ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ– মহাশয়, সদানন্দ, কারাগার ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা। **আ + ই = এ** যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ পরম + ঈশ= পরমেশ। **আ + ঈ = এ** মহা + ঈশ = মহেশ

এরূপ– রমেশ. নরেন্দ্র, নরেশ, স্বেচ্ছা, শ্রবণেন্দ্রিয়, পূর্ণেন্দু ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ =ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়। **আ + উ = ও** যথা + উচিৎ = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব। **আ + ঊ = ও** গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এরূপ–প্রশ্নোত্তর, হিতোপদেশ, পরোপকার, যথোপযুক্ত, নবোঢ়া, ফলোদয়, মহোৎসব, নীলোৎপল, চলোর্মি ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয় মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (র্) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি। **আ + ঋ = অর্** মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ– সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'– শব্দ থাকলে (অ, আ + ঋ) উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = আর শীত + ঋত = শীতার্ত। **আ + ঋ = আর** তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ–ক্ষুধার্ত, ভয়ার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয় মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য। **অ + এ = ঐ** জন + এক = জনৈক।

আ + এ =ঐ সদা + এব = সদৈব। **আ + ঐ = ঐ** মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ– সর্বৈব, হিতৈষী, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয় মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি। **অ + ঔ = ঔ** পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি। **আ + ঔ = ঔ** মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত। **ই + ঈ = ঈ** পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র। **ঈ + ঈ =ঈ** সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ– রবীন্দ্র, প্রতীত, দিল্লীশ্বর, প্রতীক্ষা, অতীব, পৃথ্বীশ, শ্রীশ, মহীন্দ্র, গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য (্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন–

ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক। **ই + উ = য্ + উ** অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত। **ই + আ = য্ + আ** ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ঈ + অ = য্ + আ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু। **ঈ + আ = য্ + আ** মসী + আধার = মস্যাধার।

এরূপ– অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার, যদ্যপি, আদ্যন্ত, প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়; ঊ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ মরু + উদ্যান = মরূদ্যান। **উ + ঊ = ঊ** বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।

ঊ + উ = ঊ বধূ + উৎসব = বধূৎসব। **ঊ + ঊ = ঊ** ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব–ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

উ + ই = ব + ই অনু + ইত = অন্বিত।

উ + এ = ব + এ অনু + এষণ = অন্বেষণ।

উ + অ = ব + অ সু + অল্প = স্বল্প।

উ + আ = ব + আ সু + আগত = স্বাগত।

উ + ঈ = ব + ঈ তনু + ঈ = তন্বী।

এরূপ– অন্বয়, মন্বন্তর, পশ্বাচার, পশ্বধম ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন– পিতৃ + আদেশ =পিত্রাদেশ, পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয়, এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন–

ঔ + অ = আব্ + অ পৌ + অক = পাবক।

ও + আ = আব্ + আ গো + আদি = গবাদি।

ও + এ = আব্ + এ গো + এষণা = গবেষণা।

ও + ই = আব্ + ই পো + ইত্র = পবিত্র।

ঔ + ই = আব্ + ই নৌ + ইক = নাবিক।

ঔ + উ = আব্ + উ ভৌ + উক = ভাবুক।

এ + অ = অয়্ + অ নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।

ঐ + অ = আয়্ + অ নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।

ও + অ = অব্ + অ পো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।

জ্ঞাতব্য

কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন– গো + অক্ষ = গবাক্ষ, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, কুল + অটা = কুলটা ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

খ. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি এবং

গ. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

ক. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

১. ক্, চ্, ট্, ত্, প্ –এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।

চ্ + অ = জ ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।

ট্ + আ = ড় ষট্ + আনন = ষড়ানন।

ত্ + অ = দ তৎ + অবধি = তদবধি।

প্ + অ = ব সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ– সদানন্দ, বাগাম্বর, কৃদন্ত, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র, তদন্ত, বাগীশ ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়, যথা–

ই + ছ = চ্ছ পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

অ + ছ = চ্ছ এক + ছত্র = একচ্ছত্র।

আ + ছ = চ্ছ কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।

এরূপ– বৃক্ষচ্ছায়া, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, স্বচ্ছন্দে, মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

ক. ১ ত্ (ৎ) ও দ্ –এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা।

ত্ + ছ = চ্ছ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

দ্ + চ = চ্চ বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়।

দ্ + ছ = চ্ছ বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

২. ত্(ৎ) ও দ্–এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে জ্ হয়। যেমন–

দ্ + জ = জ্জ বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।

ত্ + জ = জ্জ সৎ + জন = সজ্জন।

ত্ + ঝ = জ্ঝ কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

এরূপ– যাবজ্জীবন, তজ্জন্য, জগজ্জীবন, উজ্জ্বল ইত্যাদি।

৩. ত্(ৎ) ও দ্ –এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে চ্ এবং শ্–স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

এরূপ– উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি ইত্যাদি।

৪. ত্(ৎ) ও দ্–এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ + ড = ড্ড উৎ + ডীন = উড্ডীন। এরূপ– বৃহড্ঢক্কা।

৫. ত্(ৎ) ও দ্ এর পর হ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন–

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।

এরূপ– উদ্ধত, তদ্ধিত, উদ্ধৃত ইত্যাদি।

৬. ত্(ৎ) ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থলে 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ– উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন, উল্লেখ, উল্লিখিত ইত্যাদি।

খ (১). ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য>জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ধ্বনি (বা), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথমে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা–

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

ত্ + ব = দ্ + ব উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।

ত্ + র = দ্ + ও তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগদান।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন।
ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ত্ + ম = দ/ন + ম তৎ + মধ্যে = তদ্‌মধ্যে বা তন্মধ্যে।
ক্ + ন = গঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্‌নির্ণয় বা দিঙ্‌নির্ণয়।

অনুরূপ : তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, বাক্ + ময় = বাঙ্‌ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি।

৩. ম্-এর পরে যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।
ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা = শঙ্কা।
ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ– সম্মান, সন্ন্যাস, সন্ধান, কিন্নর, সন্দর্শন, কিম্ভূত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তস্থ ধ্বনি য, ও, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–

সম্ + হার = সমাহার। সম্ + সার = সংসার ।
সম্ + লাপ = সংলাপ। সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ।
সম্ + বাদ = সংবাদ। সম্ + যম = সংযম।
সম্ + শয় = সংশয়।

এরূপ– সংযোগ, সংশোধন, স্বয়ংবরা, সংবরণ, কিংবা, বারংবার, সর্বংসহা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন–

জ্ + ন = জ্ + ঞ যজ্ + না = যজ্ঞ।
চ্ + ন = চ্ + ঞ যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্>ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল।
ধ্>ত্ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ– হৃৎকম্পন্ন, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্ –এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–
বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ– তৎসম।

৮. ষ্ –এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–
ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কিছু সন্ধি হলো :
সম্ + কৃত = সংস্কৃত। উৎ + স্থাপন = উত্থাপন।
সম্ + কার = সংস্কার। উৎ + স্থান = উত্থান।

এরূপ : পরিষ্কৃত, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যেমন–

পৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি। বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি। বন্ + পতি = বনস্পতি।
এক্ + দশ = একাদশ। গো + পদ = গোষ্পদ। আ + চর্য = আশ্চর্য।
ষট্ + দশ = ষোড়শ মনস্ + ঈষা = মনীষা। পর্ + পর = পরষ্পর।
তৎ + কর = তস্কর।

৩. বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্ এর সক্ষিপ্তরূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. র্-জাত বিসর্গ এবং

২. স্-জাত বিসর্গ।

১. র্ জাত বিসর্গ : ও স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র–জাত বিসর্গ বলে। যেমন– পুনর–পুনঃ , অন্তর–অন্তঃ, প্রাতর –প্রাতঃ ইত্যাদি।

২. স্– জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্–জাত বিসর্গ। যেমন– পুরস্ – পুরঃ, নমস্ – সমঃ, শিরস্– শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয়। যথা–

১. বিসর্গ + স্বরধ্বনি

২. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ–ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ – এ তিনে মিলে ও–কার হয়। যেমন– ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি কিংবা অন্তস্থ-য, অন্তস্থ ব, ও, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন– তপঃ + বন =তপোবন, মনঃ + হার = মনোহর, তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন– পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ, অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্ত + ধান = অন্তর্ধান ইত্যাদি।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মাহপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি কিংবা য, ও, ল, ব, হ-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন– দুঃ + যোগ= দুর্যোগ, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, নিঃ + আকার = নিরাকার। **এরূপ**– নির্জন, দুরন্ত, বহির্গত, দুর্লোভ, প্রাদুর্ভাব, জ্যোতির্ময়, নিরাকরণ ইত্যাদি। **ব্যতিক্রম :** ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন– নিঃ+রস = নীরস, নিঃ + রব = নীরব ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন–

ঃ + চ/ছ = শ + চ/ছ	নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ ছেদ = শিরচ্ছেদ।
ঃ + ট/ঠ = ষ + ট/ঠ	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ঃ + ত/থ = স + ত/থ	দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুস্থ।

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থালে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ্ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন–

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক	নমঃ + কার = নমস্কার
অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ	পদঃ + খলন =পদস্খলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক নিঃ + কর = নিষ্কর।
উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক দুঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ– ভাস্কর, বাচস্পতি, চতুষ্কোণ, আবিষ্কার, দুষ্কৃতি, বিহিষ্কৃত, দুষ্প্রাপ্য, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, চতুষ্পদ, রিতস্কার, মনস্কামনা, পুরস্কার ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ পায় না। যেমন–

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন– নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ, দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ, নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ ইত্যাদি। কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

অহঃ + অহ = অহরহ অহঃ + নিশ = অহর্নিশ,
ভাঃ + কর = ভাস্কর বাচঃ + পতি = বাচস্পতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. **সঠিক উত্তরটি লিখুন।**

১. সন্ধি শব্দের অর্থ কী?
ক. চুক্তি খ. ঐক্য
গ. সম্মিলন ঘ. মিলন

২. সন্ধির উদ্দেশ্য কী?
ক. উচ্চারণ দীর্ঘ করা খ. উচ্চারণ সহজ করা
গ. উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতি মধুর করা ঘ. মাধুর্য সৃষ্টি করা

৩. বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?
ক. এক প্রকার খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. বহু প্রকার

৪. স্বরধ্বনি সংগে স্বরধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?
ক. স্বরধ্বনি সন্ধি খ. স্বরসন্ধি
গ. ব্যঞ্জন সন্ধি ঘ. মিশ্রসন্ধি

৫. আ এর পর আ থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?
ক. অ খ. ও
গ. আ ঘ. ই

৬. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?
ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার ঘ. দুই প্রকার

৭. ই-কারের সঙ্গে ই-কারের যুক্ত হলে হয়-
ক. ও-কার খ. ই-কার
গ. ঈ-কার ঘ. উ-কার

৮. শীতার্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-
ক. শিত + আর্ত খ. শীত + ঋত
গ. শীতা + আর্ত ঘ. শীতল + আর্ত

৯. বিসর্গ সন্ধি কত প্রকার?
ক. এক প্রকার খ. চার প্রকার
গ. অনেক প্রকার ঘ. দুই প্রকার

১০. র এর স্থানে বিসর্গ হলে তাকে বলে-

ক. স-জাত বিসর্গ　　খ. অ-জাত বিসর্গ

গ. র-জাত বিসর্গ　　ঘ. ম-জাত বিসর্গ

১১. অ+ ঃ + অ মিলে কী হয়?

ক. অ　　খ. আ

গ. ও　　ঘ. ই

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।

৩. খাঁটি বাংলা ও তৎসম সন্ধির পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

বারেক, নিন্দুক, হিতাহিত, স্বেচ্ছা, সূর্যোদয়, ক্ষুধার্ত, মতৈক্য, অত্যধিক, অন্বেষণ, গায়ক, লবণ, দিগন্ত, পরিচ্ছদ, উচ্ছেদ, উদ্ধার, ষড়যন্ত্র, সঞ্চয়, সংযোগ, ষোড়শ, কিংবা, মনোযোগ, নিরাকার, নিষ্ঠুর, কথামৃত, মহাশয়, রাজর্ষি, ক্ষুধার্ত, জনৈক, মহৌষধ, তন্বী, ভাবুক, উদ্যোগ, দিগ্বিজয়, সঞ্চয়, সংবাদ, সম্রাট, তৎপর, আশ্চর্য, শঙ্কা, কিংবা, রাজ্ঞী, সংস্কার, ষোড়শ।

৫. **সন্ধি করুন :**

মহা + ঔষধ; ইতি + আদি; পরি + ঈক্ষা; মরু + উদ্যান; সু + আগত; ভো + অন; সৎ + চিন্তা; উৎ + লেখ; উৎ + যোগ; শম্ +কা; রাজ + নী; ষষ্ + থ; বন + পতি; মনঃ + হর; অন্তঃ+ গত; মনঃ + কষ্ট, গো + এষণা, নৌ + ইক, অনু + ইত, রবি + ইন্দ্র, মহা + ঋষি, যথা + ইচ্ছা, বাক্ + ঈশ, বাক্ + আড়ম্বর, সৎ + উপায়, উৎ +হত, তরু + ছায়া, পদ্ + হতি, সৎ + জন, উৎ + লাস, ততঃ + অধিক, মনঃ + রম, অন্তঃ + ধান, পুনঃ + বার, দুঃ + যোগ, নিঃ + লোভ, মনঃ + কষ্ট,　　নিঃ + স্তব্ধ।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ　২. গ　৩. খ　৪. খ　৫. গ　৬. গ　৭. গ　৮. খ　৯. ঘ　১০. গ　১১. গ